ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার উন্নয়ন

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (DUCSU) - গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নির্বাচনী ইশতেহার

## *স্বতন্ত্র প্রার্থী: মোহাম্মদ মাজেদুর রহমান*

## বিভাগভিত্তিক Research & Publication Hub

**“প্রতি বিভাগে গবেষণা—সবার জন্য, সবসময়।”**

**কেন জরুরি:** বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে গবেষণা সহায়তার জন্য সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের অভাবে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক বিভাগেই গবেষণাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখা হয় এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অনুপ্রেরণার অভাব রয়েছে। এর ফলে গবেষণার মান ও পরিসর কমে যায় এবং বহু শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে।

**আমি কী করব:** প্রতিটি বিভাগে একটি করে Research & Publication **হাব** স্থাপন করা হবে, যেখানে একজন সমন্বয়ক অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্বে গবেষণা-সহায়ক কার্যক্রম চলবে। এই হাবে থাকবে –

- **গবেষণা আইডিয়া ক্লিনিক:** নতুন গবেষণা ধারণা নিয়ে পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা সেবা, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আইডিয়াগুলো পরিমার্জন করতে পারে।
- **প্রপোজাল রিভিউ ডেস্ক:** গবেষণা প্রস্তাবনা/প্রোটোকল পর্যালোচনায় সহায়তা, যাতে প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার আগে গুণগত মান নিশ্চিত হয়।
- **রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট সহায়তা:** গবেষণার সূত্রব্যবস্থাপনা ও তথ্যসূত্র সংগ্রহে টুল ব্যবহারে সহায়তা।
- **ভাষা সম্পাদনা সাপোর্ট:** গবেষণাপত্র ও থিসিসে ভাষাগত সম্পাদনায় সহায়তা, যাতে লেখার মান উন্নত হয়।
- **প্রকাশনা সংক্রান্ত পরামর্শ ও গ্রান্ট:** কোথায় এবং কীভাবে গবেষণা প্রকাশ করা যায় সে পরামর্শ, এবং প্রয়োজন হলে ছোট পরিসরে প্রকাশনা ফি বা খরচের জন্য মাইক্রো-গ্রান্ট সুবিধা।
- **কেন্দ্রীয় “রিসার্চ টুলকিট”:** গবেষণা করার পদ্ধতি, রেফারেন্স টেমপ্লেট, চেকলিস্ট ও অন্যান্য রিসোর্স সমন্বিত একটি গাইড যা সকল বিভাগের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- ১০টি বিভাগে পাইলট হিসেবে গবেষণা ও প্রকাশনা হাব চালু করা।
- সাপ্তাহিক “Research Hour” আয়োজন করে নিয়মিত গবেষণা আলোচনার সূচনা করা।
- কেন্দ্রীয় গবেষণা টুলকিট প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রকাশ করা।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- সকল অনুষদ মিলিয়ে কমপক্ষে ৪০টি বিভাগীয় গবেষণা হাব বিস্তার করা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি বিভাগই আওতায় আসে।
- ৩০০-এরও বেশি গবেষণা প্রস্তাবনা (প্রপোজাল) পর্যালোচনা সেবা প্রদান করা।
- ২০০-এরও বেশি গবেষণা পোস্টার বা পেপার তৈরিতে পরামর্শ ও সম্পাদনা-সহায়তা দেওয়া।
- বিভাগীয় পর্যায়ে **Working Paper Series** চালু করা, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক গবেষণা প্রকাশিত হবে।

**মাপকাঠি:**

- মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি হাবের কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে ড্যাশবোর্ড প্রকাশ (যেখানে পর্যালোচনার সংখ্যা, সহায়তা সেশনের পরিসংখ্যান থাকবে)।
- ত্রৈমাসিক ওপেন-হিয়ারিং সেশন আয়োজন, যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ফিডব্যাক দিতে পারবেন এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতে উদ্যোগগুলোর উন্নয়ন করা হবে।

## পয়েন্ট ২: ওপেন-অ্যাক্সেস ডিজিটাল রিপোজিটরি

**"ঢাবির জ্ঞান হবে সবার জন্য উন্মুক্ত।"**

**কেন জরুরি:** বর্তমানে অনেক মূল্যবান থিসিস, প্রজেক্ট ও গবেষণা প্রতিবেদন শুধু লাইব্রেরি বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে সীমাবদ্ধ থাকে; সাধারণ শিক্ষার্থী বা গবেষকরা সেগুলোতে সহজে অ্যাক্সেস করতে পারেন না। ওপেন-অ্যাক্সেস ডিজিটাল রিপোজিটরি থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডার সবার জন্য উন্মুক্ত হবে, জ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হবে।

**আমি কী করব:** একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল রিপোজিটরি প্ল্যাটফর্ম চালু করব, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনার্স থিসিস, মাস্টার্স থিসিস, গবেষণা প্রজেক্ট রিপোর্ট, সেমিনার পেপার ইত্যাদি আপলোড ও সংরক্ষণ করা হবে। আধুনিক **সার্চ** ফিচার যুক্ত এই রিপোজিটরিতে যে কেউ (দেশে বা বিদেশে) অনলাইনে এসব কাজের শিরোনাম/কীওয়ার্ড দিয়ে খুঁজে প্রয়োজনীয় থিসিস/প্রবন্ধ **ডাউনলোড** করতে পারবেন। এতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভিত্তিক অবদান বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের কাছেও পৌঁছে যাবে। গবেষণা কাজ ওপেন-অ্যাক্সেসে উন্মুক্ত করলে তা গুগলসহ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে দ্রুত দেখা যায় এবং উদ্ধৃতির পরিমাণ গড়ে ২২-৪৪% পর্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রকাশিত কাজের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। রিপোজিটরির ডেটাবেসে সংশ্লিষ্ট লেখকের নাম, বিভাগ, বছরের তথ্য থাকবে, যা ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- বিদ্যমান ছাপা থিসিস/প্রকল্প রিপোর্ট সংগ্রহ শুরু করে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নেওয়া (প্রথমে ৩টি অনুষদের পাইলট হিসাবে)।
- একটি Self-Upload পোর্টাল চালু করা, যেখানে সদ্য স্নাতকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের থিসিস/প্রজেক্টের PDF আপলোড করতে পারবেন (নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে)।
- পাইলট পর্যায়ে নির্বাচিত কিছু বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে রিপোজিটরির কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- রিপোজিটরিতে কমপক্ষে ১০,০০০+ নথি (থিসিস, প্রজেক্ট রিপোর্ট, গবেষণা পেপার ইত্যাদি) সংরক্ষণ করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদের অধীনে থাকা বিভাগগুলোকে পর্যায়ক্রমে এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা।

**মাপকাঠি:**

- রিপোজিটরির মাসিক অ্যানালিটিক্স (নতুন সংযুক্ত নথির সংখ্যা, ডাউনলোডের সংখ্যা, ভিজিটর সংখ্যা ইত্যাদি) প্রকাশ করা।
- ওপেন ডেটা রিপোর্ট – প্রতি বছর রিপোজিটরির সমস্ত ডেটা ও পরিসংখ্যান উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করে সবাইকে অবহিত রাখা (স্বচ্ছতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য)।

## শিক্ষার্থীদের পিয়ার-রিভিউড জার্নাল

### "শিক্ষার্থীর লেখা, শিক্ষার্থীর সম্পাদনা, সবার পাঠ।"

**কেন জরুরি:** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে **পিয়ার-রিভিউ** (সহকর্মী পর্যালোচনা) প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি একাডেমিক লেখালিখির মানোন্নয়ন ও গবেষণা-মনস্কতা গড়ে তোলে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের লেখা অনেক ভালো প্রবন্ধও প্রকাশের সুযোগ পায় না বা তারা পিয়ার-রিভিউ প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নিজের গবেষণা অন্যের মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করার অভ্যাস না থাকলে একাডেমিক দক্ষতা পূর্ণতা পায় না।

**আমি কী করব:** অনুষদভিত্তিক **Student Peer-Reviewed Journal** চালু করব, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গবেষণা প্রবন্ধ জমা দিতে পারবেন এবং সেই জার্নালের সম্পাদক ও রিভিউয়ার হবেন মূলত শিক্ষার্থীরাই (অবশ্যই অভিজ্ঞ শিক্ষক মেন্টর প্যানেলের পরামর্শে)। প্রতিটি জার্নালের জন্য একটি পরিষ্কার সম্পাদকীয় নীতিমালা ও পর্যালোচনা (রিভিউ) প্রক্রিয়া থাকবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গবেষণা প্রবন্ধ বাছাই, সম্পাদনা ও মূল্যায়নের কাজ শিখবেন। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা জার্নাল আছে, যা শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের কাজকে জনসমক্ষে তুলে ধরার সুযোগ দেয়। আমাদের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের লেখার মান উন্নয়ন, সমালোচনামূলক চিন্তাধারা বিকাশ এবং প্রকাশনার বাস্তব অভিজ্ঞতা দেবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- প্রতিটি সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে দুটি অনুষদে পাইলট **স্টুডেন্ট জার্নাল** শুরু করা (উদাহরণঃ সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদে)।
- সম্পাদকীয় নীতিমালা ও সাবমিশন গাইডলাইন প্রণয়ন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, যাতে আগ্রহী লেখক ও রিভিউয়াররা মানদণ্ড সম্পর্কে জানেন।

- শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সম্পাদকমণ্ডলী ও রিভিউয়ার প্যানেল গঠন করা (প্রতি জার্নালে শিক্ষক পরামর্শক থাকবে মান বজায় রাখতে)।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- মোট ৮টি সংখ্যার শিক্ষার্থী জার্নাল প্রকাশ (বিভিন্ন অনুষদের আওতায় ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ৮টি আলাদা জার্নাল ইস্যু বা ভলিউম বের করা)।
- ২০০টিরও বেশি প্রবন্ধ জমা গ্রহণ করা এবং যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই মধ্য থেকে অন্তত ১০০টি মানসম্মত প্রবন্ধ প্রকাশ করা।
- জার্নালের সমস্ত প্রকাশনা অনলাইনে **ওপেন-অ্যাক্সেস** রাখা, যাতে অন্য শিক্ষার্থী ও গবেষকরা সেগুলো বিনামূল্যে পড়তে ও উদ্ধৃতি দিতে পারেন।

**মাপকাঠি:**

- প্রতি সংখ্যায় জমাপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিসংখ্যান রাখা (গ্রাফ সহ রিপোর্ট প্রকাশ করে দেখানো কত শতাংশ প্রবন্ধ গৃহীত/প্রকাশিত হলো)।
- প্রতিটি জার্নালের অনলাইনে ভিউ ও ডাউনলোডের সংখ্যা এবং কোনো প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়েছে কিনা তার ডেটা সংগ্রহ করা।
- শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করা – যেমন কতজন নতুন করে লিখতে উৎসাহিত হলো, পিয়ার-রিভিউ অভিজ্ঞতা থেকে কী শিখল – এসব নিয়ে বছরে একটি ফিডব্যাক রিপোর্ট।

## গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ

### “শিখুন, প্র্যাকটিস করুন, প্রকাশ করুন।”

**কেন জরুরি:** অনেক শিক্ষার্থীই গবেষণার পদ্ধতি, পরিসংখ্যানের প্রয়োগ, একাডেমিক লিখনশৈলী, লিটারেচার রিভিউ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দক্ষতায় দুর্বল থাকে। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপের অভাবে ভালো আইডিয়া থাকলেও তারা গবেষণা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার এই অভাব দূর করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞরাও জোর দিচ্ছেন যে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব ও দক্ষতাভিত্তিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে উন্নত মানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি গবেষণা-কেন্দ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি না করে, তবে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করা কঠিন।

**আমি কী করব:** প্রতি মাসে অন্তত একটি করে গবেষণা দক্ষতা বিষয়ক ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণের আয়োজন করব। এই কর্মশালাগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী (বর্তমানে যারা দেশে-বিদেশে গবেষণায় যুক্ত আছেন) এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞদের এনে সেশন নেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে – গবেষণা পদ্ধতি (রিসার্চ মেথডোলজি), পরিসংখ্যান ও ডেটা বিশ্লেষণ (ব্যবহারিক সফটওয়্যারসহ), একাডেমিক লেখার কৌশল, রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট টুলের ব্যবহার (যেমন Zotero/EndNote), প্লেজিয়ারিজম এড়ানোর কৌশল, উপস্থাপন দক্ষতা ইত্যাদি। প্রতিটি ওয়ার্কশপের সঙ্গে ছোট্ট করে **হ্যান্ডস-অন প্রজেক্ট** বা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীরা শিখে সাথে সাথেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং তাদের গবেষণার মান উন্নত করবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- বিভিন্ন বিভাগ থেকে চাহিদা নিরূপণ করে ৫টি পাইলট প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন (যেমন: রিসার্চ মেথডোলজি, একাডেমিক রাইটিং, ডেটা অ্যানালিসিস, প্রেজেন্টেশন স্কিল, রেফারেন্স টুল ইত্যাদি ৫টি আলাদা বিষয়)।
- প্রত্যেক ওয়ার্কশপ শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত একটি **প্রশিক্ষণ কিট** (স্লাইড, নোটস, রিসোর্স লিংক সহ) অনলাইনে প্রকাশ করা, যাতে যারা সরাসরি অংশ নেয়নি তারাও শিখতে পারে।
- স্বল্পমেয়াদি একটি "মিনি রিসার্চ প্রজেক্ট চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা, যেখানে শিক্ষার্থীরা দলগঠন করে কোন ছোট গবেষণা সম্পন্ন করবে ১-২ মাসের মধ্যে (বিশেষজ্ঞ মেন্টরের তত্ত্বাবধানে)। এটি পাইলট হিসেবে কয়েকটি বিভাগে শুরু করা হবে।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- কমপক্ষে ২০টি ভিন্ন বিষয়ের ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্পন্ন করা (প্রতি মাসে গড়ে ২টির সামান্য কম হারে হলেও চালিয়ে যাওয়া)।
- মোট ৫০০+ শিক্ষার্থীকে এসব ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা (একজন শিক্ষার্থী একাধিক ওয়ার্কশপেও অংশ নিতে পারেন, তবে পার্টিসিপ্যান্ট অন্তত ৫০০ অর্জন করতে চাই)।
- এদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (ধরি ৫০+ জন) শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ থেকে পাওয়া দক্ষতা ব্যবহার করে ছোটখাট গবেষণা প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছে বা কোনও সম্মেলনে পেপার উপস্থাপন করেছে – এমন ফলাফল অর্জন করা।

**মাপকাঠি:**

- প্রতিটি ওয়ার্কশপের শেষে অংশগ্রহণকারী মূল্যায়ন (Feedback) সংগ্রহ করে পরবর্তী কর্মশালার উন্নতি নির্ধারণ করা।
- অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা, তাদের বিভাগের বিবরণ, এবং ওয়ার্কশপের পরে তাদের অনুসরণ করে কোনো প্রকাশনা/প্রজেক্টে সম্পৃক্ত হয়েছে কিনা – এ সংক্রান্ত ডেটা সংরক্ষণ করা।

- বছরে একটি সমন্বিত রিপোর্ট প্রকাশ, যেখানে সব প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের পরিসংখ্যান, শিখনফল এবং শিক্ষার্থীদের অনুভূতির সংক্ষেপ থাকবে।

## মাইক্রো-গ্রান্ট / সিড ফান্ড

## “ছোট ফান্ড, বড় গবেষণা।”

**কেন জরুরি:** নতুন কোনও আইডিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করতে গেলেই অনেক সময়ে কিছু প্রাথমিক অর্থের প্রয়োজন হয় (যেমন: জরিপ চালানোর খরচ, ল্যাবের রিএজেন্ট, ফিল্ড ট্রিপ, ডেটা সংগ্রহ ইত্যাদি)। কিন্তু আমাদের অনেক শিক্ষার্থী বা নবীন গবেষক এই প্রারম্ভিক অর্থায়নের অভাবে তাদের সম্ভাবনাময় গবেষণা শুরু করতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্যয় বরাদ্দ ঐতিহাসিকভাবেই খুব কম – উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের মাত্র ০.৮৩% গবেষণায় খরচ হয়েছে। এত কম বরাদ্দের ফলে ছোট ছোট নতুন আইডিয়া বিশেষ কোনও সহায়তা পায় না, এবং উদ্ভাবনী অনেক উদ্যোগ শুরুতেই থেমে যায়।

**আমি কী করব:** নির্বাচিত হলে DUCSU-এর তহবিল ও বাহ্যিক স্পনসরশিপ মিলিয়ে একটি **Micro-Grant/Seed Fund** ব্যবস্থা চালু করব, যেখানে শিক্ষার্থীরা ছোট আকারের গবেষণা প্রজেক্টের জন্য অনুদান করতে পারবে। গ্রান্টের পরিমাণ হতে পারে প্রতি প্রজেক্টে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত (গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী)। একটি শক্তিশালী **আবেদন ও বাছাই প্রক্রিয়া** থাকবে – যেখানে শিক্ষার্থীদের থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হবে, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকদের সমন্বয়ে একটি জুরি বোর্ড সেরা প্রস্তাবগুলো নির্বাচন করবে। নির্বাচিত প্রকল্পগুলোকে শুধু অর্থায়নই নয়, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বা তরুণ অধ্যাপকদের মধ্য থেকে একজন করে **মেন্টর** নিয়োগ করা হবে, যিনি প্রকল্পের অগ্রগতিতে পরামর্শ দেবেন। এই Micro-grant এর লক্ষ্য হবে একেবারে শুরুর পর্যায়ে থাকা আইডিয়াগুলোকে বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়া – যাতে পরবর্তীতে বড় তহবিলের জন্য এরা আবেদন করার মতো প্রাথমিক ফলাফল ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- Micro-Grant Program-এর নীতিমালা ও **আবেদন ফরম্যাট** প্রস্তুত করে ঘোষণা দেওয়া (যাতে কী ধরনের প্রোজেক্ট অগ্রাধিকার পাবে, কীভাবে আবেদন করতে হবে ইত্যাদি পরিষ্কার উল্লেখ থাকবে)।
- প্রাথমিকভাবে ২০টি পর্যন্ত প্রকল্পে অনুদান দেওয়ার জন্য বাজেট সংস্থান করা (DUCSU বাজেট পুনর্বিন্যাস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই/স্পন্সর থেকে ফান্ড সংগ্রহ)।
- প্রথম চক্রের আবেদন গ্রহণ শুরু করা এবং ১-২ মাসের মধ্যে জুরি বোর্ডের মাধ্যমে ১৫-২০টি প্রকল্প নির্বাচন করে অনুদান প্রদান।

- মাসিক ভিত্তিতে এসব নির্বাচিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা ব্যবস্থা চালু করা।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- অন্তত ১০০টি ছোট গবেষণা প্রকল্পকে Micro-grant প্রদান করা (প্রতি ত্রৈমাসিকে গ্রান্ট দেওয়ার রাউন্ড থাকবে, প্রতি রাউন্ডে ~২৫টি করে প্রকল্প নির্বাচিত হলে বছরে ১০০টি সম্ভব)।
- প্রতিটি প্রকল্পের জন্য মেন্টরশিপ নিশ্চিত করা এবং বছর শেষে এই প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (কমপক্ষে ৫০টি) প্রকল্পের আউটপুট (প্রাথমিক ফলাফল, পোস্টার, প্রতিবেদন বা কোনো সেমিনারে উপস্থাপন) অর্জন।
- Micro-grant পাওয়া প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি **প্রাথমিক প্রকাশনা বা রিপোর্ট সংকলন** বের করা, যেখানে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, শিখন ও ফলাফলগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। এটি ভবিষ্যতে আরও ফান্ড জোগাড়ের ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

**মাপকাঠি:**

- নির্বাচিত ও অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রজেক্টের সংখ্যা এবং তাদের ক্ষেত্রে বিভাগের তালিকা প্রকাশ রাখা।
- প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি (মাসিক আপডেট) এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা একটি ড্যাশবোর্ডে দেখা যাবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) সংগ্রহ করা – যেমন এই ফান্ড তাদের কতটা কাজে লেগেছে, ভবিষ্যতে কী উন্নতি করা যেতে পারে – তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের জন্য নীতিমালা সমন্বয়।
- পরিশেষে এ প্রোগ্রামের প্রভাব মূল্যায়নে একটি সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন (কতটি প্রকল্প ভবিষ্যতে বড় অনুদান পেয়েছে বা উল্লেখযোগ্য গবেষণা পেয়েছে) প্রকাশ করা।

## ইনকিউবেটর / রিসার্চ চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রাম

## "নতুন গবেষণা, নতুন উদ্ভাবন।"

**কেন জরুরি:** অনেক সময় শিক্ষার্থীদের চমৎকার সব গবেষণা বা উদ্ভাবনের আইডিয়া থাকে, কিন্তু সেগুলোকে বাস্তব রূপ দিয়ে প্রটোটাইপ তৈরি করা বা পাইলট গবেষণা চালানোর সুযোগ পায় না। প্রয়োজন হয় একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সেরা আইডিয়াগুলো চিহ্নিত হবে এবং তাদের সহায়তা দেওয়া হবে। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ইনোভেশন ইনকিউবেটর বা গবেষণা চ্যালেঞ্জের তেমন প্রচলন নেই, ফলে আন্তর্জাতিক মানের অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগে আমরা পিছিয়ে পড়ি। উদ্ভাবনী ধারণাকে লালন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি – যেমন স্টার্টআপ ইনকিউবেটর, গবেষণা চ্যালেঞ্জ, হ্যাকাথন ইত্যাদি আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়।

**আমি কী করব:** প্রতি বছর একবার একটি বড় আকারের Research Challenge বা Innovation Incubator Program

চালু করব। এটি হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা, যেখানে শিক্ষার্থী দলগুলো সমাজের কোনো সমস্যা বা বৈজ্ঞানিক কোনো নতুন প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা/উদ্ভাবনের প্রস্তাব জমা দেবে। নির্বাচিত শীর্ষ দলগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইনকিউবেশন সুযোগ দেওয়া হবে – অর্থাৎ প্রতিটি দল পাবে একটি **উদ্ভাবনী ল্যাব** অ্যাক্সেস, মেন্টর, এবং প্রাথমিক তহবিল (সিড ফান্ড) বড় পরিসরে কাজ শুরু করার জন্য। প্রোগ্রাম শেষে দলগুলো তাদের (প্রোটোটাইপ, গবেষণা ফলাফল) উপস্থাপন করবে এবং সেরা কয়েকটি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমস্যা ভিত্তিক একটি থিম (যেমন পরিবেশ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি) নির্ধারণ করে চ্যালেঞ্জ দেওয়া যেতে পারে। এই ইনকিউবেটর প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা, বহুমাত্রিক টিমওয়ার্ক এবং উদ্যোক্তা মানসিকতা অর্জন করবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- ইনকিউবেটর/চ্যালেঞ্জের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অ্যালামনাই ও শিল্পখাত থেকে মেন্টর প্যানেল গঠন করা।
- **নিয়মাবলী ও মূল্যায়ন** kriteria তৈরি করা (কোন মানদণ্ডে আইডিয়া মূল্যায়ন হবে, দল গঠনের নিয়ম, সময়সীমা ইত্যাদি নির্ধারণ)।
- পাইলট হিসেবে একটি ছোট পরিসরের রিসার্চ চ্যালেঞ্জ ঘোষণার প্রস্তুতি – যেখানে প্রাথমিকভাবে ৫–১০টি দলকে ইনকিউবেশন সুবিধা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য ইনকিউবেটর সম্পর্কিত রিসোর্স কিট (গাইডলাইন, সময়রেখা, পরামর্শ) প্রস্তুত করা যাতে তারা সহজে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বুঝতে পারে।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- কমপক্ষে ৫০টি শিক্ষার্থী দল/প্রকল্প এই Research Challenge এ অংশগ্রহণ করবে (বিভিন্ন বিভাগ ও অনুষদ থেকে দল আসবে যাতে আন্তঃবিভাগীয় উদ্ভাবনও ঘটে)।
- ইনকিউবেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে অন্তত ৫টি উল্লেখযোগ্য (উদাহরণ: নতুন ডিভাইস/সফটওয়্যারের প্রোটোটাইপ, গবেষণা পেপার, পেটেন্ট আবেদন বা সামাজিক উদ্যোগের মডেল) তৈরি হবে বা উপস্থাপিত হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী একটি **Innovation Incubator** সেল গঠন করা (যেখানে প্রতি বছর এই প্রোগ্রাম চালানোসহ সারাবছর ধরে উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলোর মেন্টরশিপ অব্যাহত রাখা হবে)।

**মাপকাঠি:**

- অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা, আইডিয়ার বৈচিত্র্য এবং অগ্রগতির একটি বিস্তারিত তালিকা রাখা হবে।
- প্রতিটি দলের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে মাসিক মেন্টর ফিডব্যাক রিপোর্ট রাখা (কে কতদূর এগোল, কী চ্যালেঞ্জ আসছে ইত্যাদি)।

- প্রোগ্রাম শেষে成果ের প্রদর্শনী/ডেমো-ডে আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটির মতামত নেওয়া হবে এবং পরবর্তী বছরে কী উন্নয়ন করা যায় তা নির্ধারণ করা হবে।
- ইনকিউবেটর থেকে বেরিয়ে আসা সফল প্রকল্পগুলোর ওপর ফলো-আপ (কয়েকটি প্রকল্প কি পরবর্তীতে বড় তহবিল পেল, মার্কেটে গেল, বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেল?) এবং সেগুলোর গল্প বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনায় প্রচার করা, যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীও উৎসাহিত হয়।

## গবেষণা ও প্রকাশনার স্বচ্ছতা ও মান নিয়ন্ত্রণ

### "বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, ও মানের নিশ্চয়তা।"

**কেন জরুরি:** গবেষণার মান নিশ্চিত করা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি গবেষণায় চুরি (plagiarism) বা অনৈতিক prática চলতে থাকে, তাহলে আমাদের ডিগ্রি ও প্রকাশনার প্রতি আস্থা কমে যাবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও গবেষণাপত্র/থিসিসে প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক। উদাহরণস্বরূপ, এক অধ্যাপকের পিএইচডি থিসিসে ৯৮% প্লেজিয়ারিজম পাওয়া গিয়েছিল – এ ধরনের ঘটনা আমাদের গবেষণা সংস্কৃতির দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে। গবেষণা ও প্রকাশনায় নৈতিকতা বজায় রাখা এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তৈরি না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের অবস্থান দুর্বল হবে।

**আমি কী করব:** DUCSU গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে আমি একটি শক্তিশালী Research Ethics & Quality Assurance ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যা প্রশাসনের complement হিসেবে কাজ করবে। এর আওতায় –

- **Ethical Guideline:** শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য গবেষণা নৈতিকতা গাইডলাইন প্রস্তুত ও বিতরণ করব, যেখানে প্লেজিয়ারিজম কী, কোনটা গবেষণায় অনুচিত, রেফারেন্স দেওয়ার নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিত থাকবে।
- **Plagiarism Check:** বিভাগীয় লাইব্রেরি/হাবগুলোতে থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট জমার আগে বাধ্যতামূলক প্লেজিয়ারিজম স্ক্যান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে Turnitin-এর মতো সফটওয়্যারের অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করব, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই জমা দেওয়ার আগেই নিজের কাজ স্বেচ্ছায় যাচাই করতে পারেন।
- **মানদণ্ড ও চেকলিস্ট:** বিভিন্ন ধরণের একাডেমিক লেখার জন্য (থিসিস, জার্নাল পেপার, প্রজেক্ট রিপোর্ট) একটি মানদণ্ড চেকলিস্ট তৈরি করে দেওয়া হবে। যেমন থিসিসের জন্য অধ্যায় বিন্যাস, রেফারেন্স স্টাইল থেকে শুরু করে কন্টেন্টের

মৌলিকতা যাচাই – প্রতিটি ধাপে কী দেখতে হবে তার চেকলিস্ট থাকবে, যা বিভাগের অভ্যন্তরীণ বোর্ড অনুসরণ করবে।

- **নিয়মিত অডিট:** প্রতি ছয় মাস বা বছর শেষে একটি স্বতন্ত্র প্যানেল (শিক্ষক, অ্যালামনাই গবেষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি) বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন হওয়া নির্বাচিত কিছু থিসিস/গবেষণাপত্রের মান পর্যালোচনা করবে (নমুনা জরিপের ভিত্তিতে)। এই **রিসার্চ অডিট** থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বিভাগীয় প্রধান ও একাডেমিক পরিষদে জমা দেওয়া হবে মানোন্নয়নের জন্য।

- **স্বচ্ছতা রিপোর্ট:** গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সকল উদ্যোগ (যেমন Micro-grant, জার্নাল, রিপোজিটরি ইত্যাদি) এবং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে প্রতি বছর একটি Transparency Report প্রকাশ করবে DUCSU গবেষণা ও প্রকাশনা উইং। এতে উল্লেখ থাকবে বছরে মোট কতগুলো প্রকাশনা হলো, কতগুলো প্লেজিয়ারিজম কেস ধরা পড়লো ও নিষ্পত্তি হলো, গড় মান কেমন হচ্ছে ইত্যাদি সামগ্রিক চিত্র। এই রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- প্লেজিয়ারিজম চেক সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা চালু করা (যে বিভাগগুলোতে সফটওয়্যার নেই, সেখানে স্বল্প-মেয়াদে অনলাইনে ওপেন সোর্স টুল দিয়ে স্ক্যান করার ট্রেনিং দেওয়া)।

- একটি সংক্ষিপ্ত **রিসার্চ এথিক্স** ওয়ার্কশপ আয়োজন, যেখানে ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে এই বিষয়ে সচেতন করা হবে; বিশেষ করে নতুন যে গাইডলাইন তৈরি হবে তা ওয়ার্কশপে পরিচিত করা।

- গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ৫-৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন (যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকবে) যারা পাইলট ভিত্তিতে ২-৩টি বিভাগে থিসিস/প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাতে উন্নতির পরামর্শ দেবে।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ১০০% থিসিস ও প্রকাশনার জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিত করা (প্রত্যেকটি জমাদানকৃত থিসিস হয় বিভাগীয় পর্যায়ে স্ক্যান ও চেক হয়ে যাবে নিশ্চিত করা হবে)।

- প্লেজিয়ারিজম এবং গবেষণা অনিয়ম সম্পর্কিত অভিযোগের দ্রুত তদন্ত ও নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী Ethics Review Panel প্রস্তাব করা (যা ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে)।

- বার্ষিক স্বচ্ছতা রিপোর্ট প্রকাশনার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং সেই রিপোর্টের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে মিলিত হয়ে অন্তত ৩টি নীতিগত উন্নয়ন (policy change) নিয়ে আসা – যেমন গবেষণা জমার ফরম্যাট統—করণ, বা অধ্যাপক-শিক্ষার্থীর জন্য নিয়মিত এথিক্স ট্রেনিংকে বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি।

**মাপকাঠি:**

- **Compliance রিপোর্ট:** প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউট কি শতভাগ থিসিস/প্রজেক্ট প্লেজিয়ারিজম স্ক্যান করছে ও মানদণ্ড মেনে চলছে কিনা তার রিপোর্ট সংগ্রহ করা (নির্দিষ্ট সূচক – কত শতাংশ কাজ স্ক্যান হয়েছে, কতগুলো ব্যত্যয় পাওয়া গেছে)।
- শিক্ষার্থীদের ও অধ্যাপকদের ফিডব্যাক – এধরনের মান নিয়ন্ত্রণে তারা সুবিধা পেল কিনা, গবেষণার মান নিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে কিনা, ইত্যাদি জরিপ করা।
- প্লেজিয়ারিজম বা অনিয়ম ধরা পড়ার সংখ্যা বছরের তুলনায় পরের বছরে কতটা কমলো বা নিষ্পত্তির সময় কতটা কমলো – এসব পরিমাপ করে দেখা।
- সবশেষে, মান নিয়ন্ত্রণ কমিটির সুপারিশের বাস্তবায়ন হার ট্র্যাক করা (যে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে তার কতটি বাস্তবায়িত হয়েছে)। এগুলো প্রকাশ্যে জানানো হবে যাতে সবাই দায়িত্ববোধ অনুভব করে।

## গবেষণা সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং

### "একসাথে গবেষণা, একসাথে সাফল্য।"

**কেন জরুরি:** আধুনিক গবেষণার বড় বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্বিষয়ক ও সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। একটি বিভাগের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে অনেক সময় উৎকর্ষ অর্জন কঠিন হয়, কারণ জটিল বাস্তব সমস্যাগুলো সমাধানে বিভিন্ন বিষয় ও দক্ষতার মেলবন্ধন প্রয়োজন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ বিভাগই নিজেদের গণ্ডিতে গবেষণা করছে; শিল্প প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যৌথ প্রকল্প কম। এতে করে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা ও বহুমাত্রিক দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের গবেষণার পরিসরও ছোট্ট গণ্ডিতে সীমিত থাকছে। এক বিভাগে সম্পদ বা দক্ষতার অভাব থাকলেও অন্য বিভাগের সাথে বা বাইরের প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে তা পূরণ করা যেতে পারে – এই মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

**আমি কী করব:** একটি Collaborative Research Network Platform প্রতিষ্ঠা করব, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অ্যালামনাই এবং বাহ্যিক পার্টনার (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) একটি ফোরামে যুক্ত হবেন। এটির মাধ্যমে –

- **ইন্টারডিসিপ্লিনারি প্রজেক্ট:** বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে যৌথ গবেষণা প্রকল্প করার আহ্বান জানানো হবে। DUCSU এর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়ে যেমন "Climate Change and Urban Health" বা "ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ" এর মতো বিষয়ে আন্তঃবিভাগীয় টিম বানিয়ে প্রজেক্ট গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

- **জাতীয় গবেষণা নেটওয়ার্ক:** দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে যৌথ সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রজেক্ট আয়োজন করব। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সুবিধা সীমিত (যেমন কোনো বিশেষ যন্ত্রপাতি), সেখানে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে গবেষণা করার পথ সুগম করব।

- **আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপ:** বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দফতরের সাথে মিলিত হয়ে কিছু MoU (সমঝোতা স্মারক) সাইন করতে কাজ করব, যেগুলোর আওতায় আমাদের শিক্ষার্থীরা বিদেশের কোনো ল্যাব বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পমেয়াদি গবেষণা প্রোজেক্টে অংশ নিতে পারে এবং সেখানকার শিক্ষার্থীরা আমাদের এখানে আসতে পারে।

- **অনলাইন প্ল্যাটফর্ম:** একটি অনলাইন পোর্টাল বা ফোরাম তৈরি করব যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণা আইডিয়া বা আগ্রহ পোস্ট করতে পারবেন, এবং অন্য বিভাগের/বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি সেই কাজে আগ্রহী তিনি যোগাযোগ করতে পারবেন। এটি মূলত "রিসার্চ ম্যাচমেকিং" এর মতো কাজ করবে, যেন যৌথ গবেষণার বীজ বপন হয়।

- **নিয়মিত নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট:** প্রতি দুই মাসে একবার "Research Mixer" বা নেটওয়ার্কিং সেশন আয়োজন করব, যেখানে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক এবং অতিথি হিসেবে শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তি আসবেন। এখানে সবাই নিজেদের কাজ বা আইডিয়া শেয়ার করবেন, সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- Collaborative Research Platform-এর প্রয়োজন ও কাঠামো নির্ধারণে ৫টি আন্তঃবিভাগীয় গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন (বিভিন্ন অনুষদের প্রতিনিধি নিয়ে), যাতে চাহিদা এবং সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত হয়।

- একটি **অনলাইন রিসার্চ নেটওয়ার্ক পোর্টাল** (Facebook Group বা স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট) প্রাথমিকভাবে চালু করা যেখানে সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকেউ জয়েন করতে পারবেন এবং গবেষণা সহযোগিতার আহ্বান জানাতে পারবেন।

- পাইলট হিসেবে ৫টি আন্তঃবিভাগীয় যৌথ গবেষণা প্রকল্প শনাক্ত করা (যেমন: জীববিজ্ঞান + কম্পিউটার বিজ্ঞান মিলে বায়OINformatics প্রজেক্ট; অর্থনীতি + উন্নয়ন অধ্যয়ন মিলে সামাজিক গবেষণা ইত্যাদি) এবং সেগুলোতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক/সামান্য ফান্ড/সমন্বয় সহায়তা দেয়া শুরু করা।

- প্রথম নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট "Research Mixer" আয়োজন করা, যেখানে অন্তত ৫০ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নেবেন এবং নিজেদের আগ্রহ তুলে ধরবেন।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- কমপক্ষে ২০টি আন্তঃবিভাগীয় যৌথ গবেষণা প্রকল্প শুরু করা বা সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা (ছোট-বড় মিলিয়ে, যাতে অন্তত দুই বা ততোধিক বিভাগ জড়িত আছে এমন প্রকল্পের গণনা)।

- জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মিলে ৫টি যৌথ কর্মশালা/সেমিনার/প্রকল্প আয়োজন করা (যার মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় হবে)।

- আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের আওতায় অন্তত ৫টি আদান-প্রদান কর্মসূচি (Exchange) সম্পন্ন করা – যেমন ২ জন বিদেশি শিক্ষার্থী/রিসার্চ ইন্টার্ন আমাদের ল্যাবে এসেছে এবং আমাদের ২ জন বাইরে গেছে এরকম কয়েকটি 사례 তৈরি করা।
- অনলাইন রিসার্চ নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মে ৫০০+ সক্রিয় সদস্য যোগ করা এবং সেখানে নিয়মিত (সাপ্তাহিক/মাসিক) আলোচনা পোস্ট হওয়া শুরু করা (অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মটি সক্রিয় কমিউনিটি হিসেবে গড়ে তোলা)।

**মাপকাঠি:**

- যৌথ প্রকল্পের সংখ্যা ও তাদের成果 সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ করা (কোন কোন বিভাগ মিলে কী কাজ করছে, কতদূর অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্যসহ)।
- নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, নতুন গড়ে ওঠা সংযোগ (যেমন ইভেন্ট থেকে কয়টি নতুন প্রজেক্টের আইডিয়া এসেছে) এগুলো ট্র্যাক করা।
- অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্টিভিটি পরিমাপ – যেমন পোস্ট/প্রস্তাবের সংখ্যা, প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা, ইত্যাদি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম উন্নত করা।
- অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক – যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়ে তারা কী শিখল, ভবিষ্যতে কী চায় – তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা সাজানো।
-

## শিক্ষার্থীদের গবেষণা অর্জনের স্বীকৃতি ও পুরস্কার

### “পরিশ্রমের স্বীকৃতি, উৎসাহের শক্তি।”

**কেন জরুরি:** স্বীকৃতি ও পুরস্কার হলো যে কোনো প্রচেষ্টার জন্য শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে চমৎকার গবেষণা কাজ করে, উদ্ভাবনী প্রজেক্ট চালায় অথবা আন্তর্জাতিক পরিসরে কৃতিত্ব দেখায়, কিন্তু সেগুলোর যথাযথ স্বীকৃতি অনেক সময় পায় না। স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে বহু শিক্ষার্থীর কাজ আড়ালে থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার উৎসাহ কমে যায়। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হয়, যা ক্যাম্পাসে গবেষণার আবহ সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন কালচার গড়ে তোলা দরকার, যাতে সবার মধ্যে গুণগত গবেষণার প্রতিযোগিতা ও গর্বের অনুভূতি আসে।

**আমি কী করব: বার্ষিক Research Awards** চালু করব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যা DUCSU-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হবে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিতে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হবে, যেমন –

- **সেরা গবেষণা প্রবন্ধ (Best Paper Award):** আন্তর্জাতিক বা স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের গবেষণা প্রবন্ধের জন্য।
- **উদ্ভাবনী প্রজেক্ট পুরস্কার:** কোনো সৃষ্টিশীল বা প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্প যা উল্লেখযোগ্য দেখিয়েছে (প্রোটোটাইপ তৈরি, স্টার্টআপ উদ্যোগ বা সামাজিক উদ্ভাবন) – এর জন্য।
- **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পুরস্কার:** যারা বছরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রতিযোগিতা বা প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনেছে (বেস্ট প্রেজেন্টেশন, প্যাটেন্ট, পুরস্কার ইত্যাদি পেয়েছে) – তাদের জন্য বিশেষ ক্যাটেগরি।
- **অন্যান্য:** বিভাগভিত্তিক সেরা থিসিস, আন্ডারগ্র্যাড গবেষণা পোস্টার পুরস্কার ইত্যাদি (পর্যায়ক্রমে ক্যাটেগরি বাড়ানো যেতে পারে)।

পুরস্কার হিসেবে থাকবে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং একটি সম্মাননা অর্থ (প্রতীকী অর্থমূল্য, যা DUCSU বাজেট থেকে আসবে অথবা স্পনসরশিপের ব্যবস্থা করা হবে)। পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক স্মরণিকায় প্রকাশ করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও হাইলাইট করা হবে, যাতে তারা এক ধরনের স্থায়ী স্বীকৃতি পান। একটি জুরি বোর্ড থাকবে (অধ্যাপক, খ্যাতনামা গবেষক ও অ্যালামনাই) যারা মনোনয়নগুলো থেকে সেরা নির্বাচিত করবে স্বচ্ছ মানদণ্ডের ভিত্তিতে। প্রতি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে (যেমন বিজ্ঞান দিবস বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সময়) জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হবে, যাতে প্রশাসন, শিক্ষক, অ্যালামনাই সবাই উপস্থিত থাকেন। এতে একটি উৎসবমুখর গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ক্যাম্পাসে।

**প্রথম ১০০ দিন:**

- পুরস্কারের ক্যাটেগরি, মানদণ্ড ও জুরি বোর্ড গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি ও প্রকাশ করা। কীভাবে মনোনয়ন জমা দিতে হবে (স্ব-মনোনয়ন বা বিভাগীয় মনোনয়ন), মূল্যায়ন সূচক কী ইত্যাদি স্পষ্ট করা হবে।
- প্রাথমিকভাবে পাইলট হিসাবে গত ১-২ বছরের অর্জনের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করে ছোট পরিসরে একবার পুরস্কৃত করা (ধরে নেই ৫টি ক্যাটেগরিতে ৫-১০ জনকে প্রথমবার দিলে)। এটি "Trial run" হিসেবে হবে, যাতে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান করার আগে আমরা ফিডব্যাক নিয়ে নিতে পারি।
- সম্ভাব্য স্পনসর/অ্যালামনাই সাপোর্ট খুঁজতে শুরু করা, যাতে পুরস্কারের জন্য অর্থায়ন বা আনুষঙ্গিক খরচে সহায়তা পাওয়া যায় (যেমন কোনো ব্যাংক/সংস্থা "DU Research Excellence Award" টাইটেল স্পনসর করতে পারে)।

**১ বছরের লক্ষ্য:**

- পূর্ণাঙ্গভাবে বার্ষিক **Research Award Ceremony** আয়োজন এবং কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী/দলকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত করা।

- এই প্রোগ্রামটি স্থায়ীভাবে চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একটি প্রস্তাবনা জমা দেওয়া, যাতে এটি DUCSU ছাড়াও ইনস্টিটিউশনাল ইভেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায় (যেমন প্রতি বছর নিয়ম করে হওয়া একটি অনুষ্ঠান)।
- পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাফল্যের গল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চ্যানেলে (প্রেস রিলিজ, নিউজলেটার, সোশ্যাল মিডিয়া) প্রচার করা, যাতে তাদের উদাহরণ অন্যদের উৎসাহিত করে। পরবর্তীতে অন্য শিক্ষার্থীরা এই পুরস্কার অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হবে।

**মাপকাঠি:**

- প্রতি বছর মনোনয়ন পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা (এর দ্বারা বোঝা যাবে কতজন গবেষণায় সক্রিয় আছেন)।
- পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংখ্যা এবং বিভাগ অনুযায়ী বিস্তার (বিশেষ কোনো অনুষদই শুধু নয়, বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষার্থীরা যেন অন্তর্ভুক্ত হয়)।
- অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া – একটি সার্ভের মাধ্যমে জানা যাবে তারা এতে কতটা অনুপ্রাণিত হলো। যদি দেখা যায় পরের বছরে মনোনয়নের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, তা হবে এই উদ্যোগের সফলতার পরিমাপক।
- দীর্ঘমেয়াদে দেখা যাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনেকে ভবিষ্যতে অসাধারণ গবেষণা করছে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই ধরণের ট্র্যাকিং (যদি সম্ভব হয় অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে) দেখাবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃতি দেওয়া তাদের ক্যারিয়ারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে কিনা।

পরিশেষে, এই ইশতেহারে উল্লিখিত সব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও প্রকাশনার সংস্কৃতিকে উৎকর্ষের এক নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়া। গবেষণার সুযোগ ও সহায়তা বৃদ্ধি পেলে আমাদের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান সৃষ্টিতে আরও আত্মবিশ্বাসী হবে, নৈতিকতা ও মান বজায় রেখে কাজ করবে, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। উপরে বর্ণিত প্রতিটি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি স্বচ্ছ, উদ্ভাবনী ও উদ্দীপনাময় একাডেমিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে **"গবেষণা"** হবে গৌরবের বিষয় এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী অনুভব করবে যে জ্ঞানচর্চায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সহযাত্রী। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ছাত্রদের জন্য জ্ঞান ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে, আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রার্থনা করছি। আপনাদের সমর্থন পেলে আমরা একসাথে একটি গবেষণামুখী, উদ্ভাবনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ব ইনশাআল্লাহ।